দৈনিক সংবাদ

31 AUG 1987

অধ্যাপক সাইদুর রহমান

050

অধ্যাপক সাইদুর রহমান (১৯০৬-১৯৮৭) ইংরেজীতে তাঁর নাম স্বাক্ষরের সময় নামের শেষাংশ "মান" খুবই স্পষ্ট ও বড় করে লিখতেন। যার পৃথক উচ্চারণ 'ম্যান'। আর এই 'ম্যান' অর্থাৎ মানুষ হিসেবেই তিনি ছিলেন একজন বড়মাপের লোক। একদা সোভিয়েত লেখক ম্যাক্সিম গোর্কী বলেছিলেন যে, "মানুষ" এই শব্দটি মহত্তম গৌরব বাচক। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন সবচেয়ে বড় যে মানুষ তার পরিচয় নাই কোন দেশে কালে। অর্থাৎ দেশকাল উত্তীর্ণ মহত্ত্বের সংজ্ঞা 'মানুষ' এই শব্দটি দ্বারা দ্যোতিত।

শিক্ষাব্রতী হিসেবে জীবন শুরু করার পিছনে তাঁর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল অবিভক্ত বাংলার শিক্ষা ক্ষেত্রে তৎকালে পশ্চাৎপদ এবং অবহেলিত মুসলিমদের শিক্ষিত করে তোলা, আত্মসচেতন করে তোলা, সর্বোপরি স্বাধীন বিচার-বুদ্ধির অধিকারী মানুষ হিসেবে যেন মুসলিমরা আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে পারে।

অধ্যাপক সাইদুর রহমান "যায় যায় দিন"-এ 'শতাব্দীর স্মৃতি' নামক আত্মজীবনীমূলক লেখায় বলেছেন, তার এই প্রচেষ্টার জন্য রাজশাহী কলেজের অধ্যক্ষ স্নেহময় দত্ত তার কনফিডেন্সিয়াল রিপোর্টে লিখেছিলেন, "জনপ্রিয় শিক্ষক বটে, তবে ছাত্রদের সাম্প্রদায়িক নেতা।" অবশ্য তার অন্য সহকর্মীরা যথা শ্রীকুমার ব্যানার্জীর মূল্যায়ন ছিল ভিন্নতর।

রাজশাহী কলেজে শিক্ষকতার সময় সেখানকার কলেজের দু'একটি ঘটনার বর্ণনা তাঁর ওই আত্মজীবনীমূলক লেখায় খোলাখুলিভাবে দিয়েছেন। এতদিন পরও এনিয়ে তাঁকে ভুল বোঝার অবকাশ থেকেই এ বিষয়টি স্পষ্ট তাঁর চরিত্রে বিরল গুণ অকপটতা এবং মুক্তবুদ্ধির একজন শিক্ষক হিসেবে তার ভূমিকাকে যথাযথ উপলব্ধি ও বিশ্লেষণ করার মত পরিবেশ সেদিনও ছিল না।

এদেশে বৃটিশ আগমনের সময়ে ডিরোজিও ছাত্রদের মধ্যে অনুসন্ধিৎসা ও জ্ঞানপিপাসা জাগ্রত করার জন্য যে ভূমিকা নিয়েছিলেন বিংশ শতাব্দীর ত্রিশদশকে আর একজন শিক্ষক ভিন্ন সামাজিক পরিবেশে ধর্মীয় বিভেদ প্রভাবিত রাজনীতির কলরোলের মধ্যে সেই কাজটি করেছেন মুসলিম ছাত্রদের ক্ষেত্রে। ডিরোজিও হিন্দু কলেজের ছাত্রদেরকে মুক্তবুদ্ধির চর্চায় উৎসাহিত করতেন। কিন্তু সাইদুর রহমান একই সাথে গরীব মুসলিম ছেলেদের জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। এক্ষেত্রে হয়তো তাকে অধিকতর সঙ্গতভাবে হাজী মোহম্মদ মহসীনের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। তথাপি অধ্যাপক সাইদুর রহমান যুগ-চেতনাকে স্বীকার করে সমাজের নির্মলতর বিকাশের স্বার্থে মূর্খতার বিরুদ্ধে অবিচলভাবে দাঁড়িয়েছিলেন।

শিক্ষকতাকালে তিনি সামাজিক কুসংস্কার, ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে, সমসাময়িক সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির বিরুদ্ধে বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে যুক্তিবাদী একজন মানুষ হিসেবে ভূমিকাও পালন করেছেন। শুধু শিক্ষার মধ্য দিয়ে মনুষ্যত্ব উদ্বোধন নয়—ছাত্রদের সমসাময়িক অসুবিধাগুলো এমনকি কখনো ব্যক্তিগত পর্যায়ে তাদের সমস্যা সমাধানে তিনি এগিয়ে এসেছেন। বেকার হোস্টেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন, রাজশাহী কলেজ থেকে এসে ইসলামিয়া কলেজে যোগদানের ঘটনার বর্ণনার মধ্য দিয়ে প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রামের পরিচয় মেলে।

দেশ ভাগ হওয়ার পর তিনি পূর্ব পাকিস্তানে সরকারী শিক্ষা বিভাগে যোগ দিলেও শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী, তার ধ্যান-ধারণার জন্য প্রথমে ঢাকা কলেজে, পরে সিলেটে মুরারীচাঁদ কলেজে তাকে বদলি করা হয়। এরপর চট্টগ্রাম কলেজে, ইডেন কলেজে অধ্যাপনা করেন তিনি। অধ্যাপক সাইদুর রহমান ভাষা আন্দোলনে ছাত্রদের ভূমিকার পিছনে "একজন উস্কানিদাতা" হিসেবেই তৎকালীন সরকারের নিকট বিবেচিত হতেন।

বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা করার পর তিনি জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। এই সময়ে তিনি খোলাখুলিভাবে ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এগিয়ে আসেন এবং এক সময় তিনি নিজেকে নাস্তিক্যবাদী হিসেবে ঘোষণা দিতেও কুণ্ঠিত হননি। ১৯৬৪ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর 'সমকাল' (অধুনালুপ্ত মাসিক সাহিত্যপত্র) তার লেখার মধ্যে একজন মুক্তবুদ্ধি মানুষের পরিচয় স্পষ্টতর অপেক্ষা তার সাহসী ভূমিকা পাঠককূলকে চমকিত করেছিল অনেক বেশী।

আধুনিক ও যুক্তিবাদী মনের প্রতিনিধি হিসেবে উনবিংশ শতকে যারা দেশের পথিকৃৎ ছিলেন তাদের অন্যতম ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং ভিন্ন প্রেক্ষিতে হলেও অক্ষয় কুমার মৈত্র-এর মতো তিনি প্রকাশ্যে সাহসী ভূমিকা গ্রহণ করেন ধর্ম সম্পর্কে স্বীয় মতামত ব্যক্ত করার ক্ষেত্রে।

মুক্তবুদ্ধির চর্চা ও শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেয়ার লক্ষ্য নিয়েই তার প্রতিষ্ঠিত সাইদুর রহমান ফাউণ্ডেশন থেকে মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি দান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মানব কল্যাণমূলক বিষয়ে বক্তৃতামালার আয়োজনের জন্য ব্যয় বহনের ব্যবস্থা করেন তিনি। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাপ্ত বেতনের অর্থ দিয়ে তিনি এই ফাউণ্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেছেন।

তার ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তী জীবনে রাজনীতি ক্ষেত্রে, জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। ছাত্রদের প্রতি অপরিসীম দরদ এবং তাদের প্রতি তার সহৃদয় লক্ষ্য রাখার কারণেই তাদের কৃতিত্বের গর্ব তাঁকেও স্পর্শ করে। 'শতাব্দীর স্মৃতি'তে বেকার হোস্টেলে অবস্থানকারী ছাত্র শেখ মুজিবুর রহমানকে হোস্টেলে ফেরার সময় শিথিল করা এবং তার দু'পেয়ালা তরকারি খাওয়ার অকুন্ঠ স্বীকারোক্তির মূল্যায়ন ও মন্তব্য যারা পড়েছেন তারা এ বিষয়ে একমত হবেন।

আচরণীয় ধর্ম হিসেবে তিনি মানব মুক্তি ও মানব কল্যাণকে বেছে নিয়েছিলেন। খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবী ও অধ্যাপক আবুল ফজলের মানবতন্ত্রের আদর্শ ও তার মানব কল্যাণ সংক্রান্ত ধ্যান-ধারণার মধ্যে সাদৃশ্য স্পষ্ট।

১৯৬৭ সালে তিনি সরকারী চাকরি থেকে অবসর নেন এবং তৎপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আংশিক সময়ের অধ্যাপনা কাজে যোগদান করেন। তিনি ফিলজফিক্যাল কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি দর্শন শাস্ত্র পড়াতেন পার্ট-টাইম অধ্যাপক হিসেবে।

নিজ গ্রামে তিনি দাতব্য চিকিৎসালয়, মাতৃসদন প্রভৃতি জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন।

দর্শনশাস্ত্রে সুগভীর পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর মিলবে তার প্রণীত 'এ্যান ইন ট্রোডাকশন টু ইসলামিক ফিলসফি' গ্রন্থে। আত্মজীবনীমূলক রচনা শতাব্দীর স্মৃতি' এবং দর্শন বিষয়ক রচনা সংকলন 'মানব কল্যাণ' প্রকাশের অপেক্ষায়। অধ্যাপক সাইদুর রহমান ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর করেছেন।

অধ্যাপক সাইদুর রহমানের মৃত্যুতে বাংলাদেশ একজন মুক্তবুদ্ধির প্রচারক ও পথিকৃৎকে হারিয়েছে, যখন দেশে সকল কর্মকাণ্ডে মানুষের উপাসনার পদ্ধতি বড় হয়ে উঠেছে এবং বাচালপ্রেসে বড় হরফে তারই অহংকারের ধ্বজা ওড়ে আর সেখানে 'মানুষ' এই পরিচয়, বর্জাইস অক্ষরের ওপরে কখনো উঠতে পারছে না।

আজকে যখন দুঃসময়ের মুখোমুখি স্বদেশ, আত্মার ঐশ্বর্য দেউলে হয়ে গেল ধনের প্রতাপের প্রতিযোগিতায় তখন মনুষ্যত্বের এই দুর্গতির বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদী কণ্ঠ ও জাগ্রত বিবেকের তিরোধান পরিণত বয়সে ঘটলেও আমাদের জন্য কোন সান্ত্বনার করুণ প্রশ্রয় বহন করে না।